গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১৩ - ১৯ নভেম্বর ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

সব প্রতিশ্রুতিই দু'পায়ে মাড়াচ্ছে মোদি সরকার

কী হল মোদি সাহেব? প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েই আপনি না বলেছিলেন 'আচ্ছে দিন' আনবেন। তার কী হল? গত দেড় বছরে জনগণের ওপর তো আপনার সরকার বহুবার মুগুর মেরেছে। ক্ষমতায় বসার ছয় মাসের মধ্যেই রেলের যাত্রী ভাড়া ১৪.২ শতাংশ এবং পণ্য মাশুল ৬.৫ শতাংশ বাড়িয়েছেন, ওষুধের দাম যেমন খুশি বাড়ানোর ছাড়পত্র কোম্পানিগুলিকে দিয়েছেন, স্বাস্থ্য বাজেট থেকে ৬,৫০০ কোটি টাকা কেটে নিয়েছেন। এসবের পরিণামে এবং চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির দাপটে এমনিতে যখন জনজীবনে আর্থিক সংকট ভয়াবহ, তখন মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আবার আপনার সরকার সব ধরনের পরিষেবা কর বাড়াল। এ বছরের জুন মাসে আপনার সরকার পরিষেবা কর ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪ শতাংশ করেছে। এবার বিহারের ভোট পার হতে না হতেই আবারও ০.৫ শতাংশ পরিষেবা কর বাড়াল 'স্বচ্ছ ভারত সেস'-এর নামে। স্বচ্ছ ভারতের পরিণতি কী, তা দেশের মানুষ দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু এই মোচ্ছবের পিছনে যে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢালা হল, তার জন্য এই সেস জনগণ বইবে কেন? এর ফল কী দাঁড়াবে? পরিবহণ খরচ, হোটেল রেস্তোঁরায় খাওয়ার খরচ, ফোনের খরচ, টিভি দেখার খরচ, সিনেমার টিকিট, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সহ সমস্ত পরিষেবার খরচ অনেক বেড়ে যাবে।

জনগণের ওপর আপনার সরকার আরও আক্রমণ নামিয়ে এনেছে রেলের টিকিট ক্যানসেলেশন চার্জ দ্বিগুণ করে দিয়ে। ট্রেন ছাড়ার ৪৮ ঘন্টা আগে টিকিট ক্যানসেল করা হলে দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে এতদিন কাটা হত ৩০ টাকা, এখন কাটা হবে ৬০ টাকা। স্লিপারে কাটা হত ৬০ টাকা, এখন কাটা হবে ১২০ টাকা। এ সি তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম শ্রেণিতে কাটা হত যথাক্রমে ৯০, ১০০, ১২০ টাকা, এখন কাটা হবে যথাক্রমে ১৮০, ২০০, ২৪০ টাকা। আবার কনফার্ম টিকিট ট্রেন ছাড়ার ১২ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ক্যানসেল করলে টিকিটের মূল্যের ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। ৪ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে ক্যানসেল করলে ৫০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। ৪ ঘন্টার

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করল বিহারের মানুষ

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখাল, বিহারের জনগণ বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। বিজেপি তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে, চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে, টাকার স্রোত বইয়ে, অজস্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েও দিল্লির মতো বিহারেও পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তিতে কোনও বিকল্প বাম-গণতান্ত্রিক জোট সামনে না থাকায় জনগণ মহাজোটকেই জয়ী করেছে। যে আশা-আকাঙ্খা থেকে বিহারের জনগণ এই মহাজোটকে জয়ী করেছেন, তা এদের দ্বারা পূরণ হওয়ার নয়। মহাজোটের শরিক সকল দলই হয় রাজ্যে না হয় কেন্দ্রে নানা সময় সরকার চালিয়েছে এবং এরা কেউই জনস্বার্থবাহী ভূমিকার পরিচয় রাখেনি, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করেছে। এরা কেউ ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক শক্তিও নয়। তাই বিহারের জনগণকেও আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে হলে তীব্র বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করতে হবে।

অনাহারে চা-বলয়
দেড় মাসে মৃত্যু ১৫

ডুয়ার্সের বন্ধ বাগরাকোট চা-বাগান সহ বিভিন্ন চা-বাগানে অনাহারে একের পর এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় আবারও শিউরে উঠছেন বিবেকবান মানুষ। কিন্তু অবিচলিত সরকার। গত দেড় মাসে মৃতের সংখ্যা ১৫। মৃত শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা অনাহার-অপুষ্টি-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কথা বললেও মন্ত্রীরা, প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্তারা এবং শাসকদলের নেতারা তা মানতে নারাজ। পাছে তাঁদের বহু বিঘোষিত 'সুশাসনে' কালির ছাপ পড়ে। তাই অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে তাঁরা স্বীকারই করেন না, রোগের কারণে মৃত্যু বলে প্রচার চালান। এটাই সরকারি লবজ। তীব্র আর্থিক অনটনে শ্রমিক মৃত্যুই হোক বা কৃষক মৃত্যু — সবেতেই তারা পারিবারিক অশান্তিকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে আরোপ করে। এই অমানবিকতায় নিষ্ঠুরতায় পূর্বতন থেকে বর্তমান শাসক — কোনও প্রভেদ নেই।

উত্তরবঙ্গের চা-বলয় আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যু-বলয়। হবে নাই বা কেন? বাগানের মালিকরা কি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয়? ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী যতটুকু দেওয়ার কথা শ্রমিকদের প্রাণধারণের জন্য, সেটুকুও কি দেয়? প্ল্যানটেশন অ্যাক্ট-১৯৫৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্যানিটেশন, শিক্ষা, বিনোদন, বাচ্চাদের ক্রেশ ইত্যাদি দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও বর্তমানে মালিকরা কি তা চূড়ান্তভাবে লঙঘন করছে না? আইনে আছে অসুস্থতার কারণে শ্রমিকদের বছরে ১৪ দিনের সবেতন ছুটি দেওয়া বাধ্যতামূলক। মালিকরা তা দিতে কি পদে পদে ঝামেলা সৃষ্টি করছে না? আইন অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও বহু চা-বাগানে তো হাসপাতালই নেই। আবার হাসপাতাল থাকলেও সর্বক্ষণের জন্য ডাক্তার নেই। পি-এফ, গ্র্যাচুইটির টাকাও কি মালিকরা আত্মসাৎ করছে না? শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরকারকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

আংশিক জয়কে পূর্ণ জয়ে পরিণত করতে হবে
অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ২৬ নভেম্বর
আইন অমান্যের ডাক দিল ছাত্র-যুবরা

কোনও রকম টালবাহানা না করে অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে ২৬ নভেম্বর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিল ছাত্র-যুবরা। সাথে রয়েছে টেট সহ সমস্ত পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদ ও বেকারদের কাজের দাবি।

ছাত্রদের মহামিছিল, সর্বভারতীয় ছাত্র ধর্মঘট, রাজভবন অভিযান, বিধানসভায় অবরোধ-বিক্ষোভ, জেলায় জেলায় মিছিল— ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে, দীর্ঘ টালবাহানার পর দেশের আরও ২০টি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারও অবশেষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালুর পক্ষে মতামত দিতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশন (ক্যাবে) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালুর সুপারিশ করেছে। 'ভোক্কল' কমিটির রিপোর্টেও পাশ-ফেল চালুর পক্ষেই বলা হয়েছে। এ সবই দেশ জুড়ে রাজনৈতিক দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) এবং ছাত্র ও যুব সংগঠন এ আই ডি এস ও এবং আই ডিওয়াই ও-র নেতৃত্বে দেশব্যাপী দীর্ঘ আন্দোলনের আংশিক জয়। শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকাভুক্ত। রাজ্য সরকার চাইলে এখনই পাশ-ফেল চালু করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারও মতামত আদান প্রদানের নামে কাল বিলম্ব করে চলেছে। তাই চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলনকে তীব্রতর করাই এখন একমাত্র পথ।

কেন্দ্রীয় নীতির দোহাই দিয়ে এ রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-

৮ নভেম্বর গোলপার্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সভায় ডি এস ও-র বিক্ষোভ। বিক্ষোভের চাপে মন্ত্রী ডি এস ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হন। সংবাদ সাতের পাতায়।

বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়েছেন একেবারে শুরুর দিন থেকে। কারণ বিগত সিপিএম সরকারের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল ও ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিষময় ফল আজও রাজ্যবাসী ভোগ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রী এই সর্বনাশা নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত

দুয়ের পাতায় দেখুন

আড়ষার হেটগুগুই পঞ্চায়েত ঘেরাও

১০০ দিনের কাজের বাস্তব রূপায়ণ, পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জল সহ ব্যবহার্য জলের ব্যবস্থা, মহিলা গ্রুপগুলির নিয়মিত কাজ, সমস্ত গরিব মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত সবুজ কার্ড প্রদান, জঙ্গল সংরক্ষণ ও এলাকার মানুষের জঙ্গলের অধিকার, রেশনে নিয়মিত চাল-গম-আটা সহ অন্যান্য জিনিস সরবরাহের দাবিতে ৩ নভেম্বর পুরুলিয়ার হেটগুগুই পঞ্চায়েত ঘেরাও করে এস ইউ সি আই (সি) হেটগুগুই লোকাল কমিটি। কিন্তু দাবিপত্র পেশ করতে গেলে ফরওয়ার্ড ব্লক-সিপিএম-ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান তা নিতে অস্বীকার করেন। পাঁচ শতাধিক মানুষের ঘেরাও দীর্ঘায়িত হতে থাকলে প্রধান বাধ্য হয়ে প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং বেশিরভাগ দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। নেতৃত্ব দেন হেটগুগুই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর আচার্য।

হরিহরপাড়ায় কৃষক বিক্ষোভ

৭ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় পাটের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি আট হাজার টাকা, সস্তায় সার বীজ কীটনাশক সরবরাহ, ভৈরব নদী সংস্কার সহ ১২ দফা দাবিতে কৃষক, গ্রামীণ মজুর ও জবকার্ড হোল্ডাররা বিক্ষোভ মিছিল, ডেপুটেশন ও পাট পোড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেন। সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হরিহরপাড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল বাজার পরিক্রমা করে বাসস্ট্যাণ্ড মোড়ে গেলে সেখানে প্রতিবাদ সভা হয়। চারজনের এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র কাছে দাবিপত্র পেশ করে। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে সেগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ও লোকাল কমিটির সভাপতি কমরেড ফকির মহম্মদ এবং এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য ও হরিহরপাড়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অমল ঘোষ। হরিহরপাড়া বাজারের রাস্তা অবরোধ করে পাট পোড়ানো হয়। পাটে আগুন দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড গোলাম মহবুব বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কমরেড বকুল খন্দকার।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা সাংগঠনিক লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড নূর ইসলাম গত ৯ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব, সহকর্মী, সমর্থক ও গুণমুগ্ধরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড বাবর আলি সহ গণসংগঠনের সদস্যদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

১৯৭৩ সালে দলের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়। নিজে পড়াশোনা করতে পারতেন না কিন্তু জানার প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল। দলের বিভিন্ন বই, গণদাবী ও পার্টি প্রকাশিত কাগজপত্র তিনি অন্য কমরেডদের পড়তে বলতেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনতেন। ১৯৮০ সালের দিকে পারিবারিক কারণে হরিহরপাড়ার কাঞ্চননগরে থাকাকালীন খাস জমি ও বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঐ সময়েই দলের পক্ষ থেকে তাঁকে আবেদনকারী সদস্যপদ দেওয়া হয়। দলের চিন্তাভাবনা প্রচারের জন্য তিনি কাজ করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি বেলডাঙা সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সদস্য মনোনীত হন। নিয়মিত গণদাবী বিক্রি, দলের জন্য চাঁদা তোলা এবং গ্রামীণ মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। আপদে-বিপদে সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। তিনি নিজে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও দলের কেউ অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিতেন প্রবল আবেগের সাথে। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে হারাল। প্রয়াত কমরেড নূর ইসলাম স্মরণে ২৭ সেপ্টেম্বর বেলডাঙায় দলের লোকাল অফিসে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল ঘোষ।

কমরেড নূর ইসলাম লাল সেলাম

ছাত্র-যুবদের আইন অমান্য

একের পাতার পর

হয়েছে। অথচ অনেক কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গদিতে বসা তৃণমূল সরকারও শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বনাশের ধারাবাহিকতাকেই অব্যাহত রেখেছে। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে বাস্তবে সমাজে দুই শ্রেণির নাগরিক তৈরি হচ্ছে। একদল বিত্তবান বেসরকারি স্কুলে লেখাপড়া করবে, আর একদল অর্থের অভাবে বাধ্য হয়ে পরিকাঠামোহীন সরকারি স্কুলে যাবে, যেখানে পাশ-ফেল নেই, নেই শিক্ষার ন্যূনতম বন্দোবস্ত। শিক্ষার সমস্ত ঠাটবাট বজায় রাখো কিন্তু তার প্রাণটা মেরে দাও— এটাই সরকারি পরিকল্পনা। গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাক, কোনও জনবিরোধী সরকারই তা চায় না। চায় না বলেই শিক্ষার বেসরকারিকরণ-ব্যবসায়ীকরণ চলে অবাধে, লাগামছাড়া ফি-বৃদ্ধি হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ কমে। সরকারি পরিকল্পনায় এ এক শিক্ষা ধ্বংসকারী মারণযজ্ঞ।

বছরের পর বছর টেট পরীক্ষা নিয়ে চলছে দুর্নীতি, প্রশ্নফাঁস, সরকারি দলের নেতাদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষের কারবার— এ যেন আর এক 'ব্যাপম' কেলেঙ্কারি। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে অথচ অপরাধীদের কোনও সাজা হচ্ছে না। চাকরি আছে শুধু সরকারি পরিসংখ্যানে, বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই। বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে মদ-জুয়া-সাট্টা আর অশ্লীলতা চর্চার অবাধ আয়োজন। যাতে হতাশায় নিমজ্জিত বেকাররা যুবসমাজ সরকারের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে রুখে না দাঁড়াতে পারে। শিক্ষার সুযোগ নেই, চাকরির সুযোগ নেই। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। ঘোর অনিশ্চয়তার এক কালো মেঘ মানুষের জীবনকে ঘিরে রেখেছে। সমাজ জুড়ে ঘন অন্ধকার নামিয়ে আনার শাসক শ্রেণির সর্বাত্মক এই আয়োজনের মধ্যেও ছাত্র-যুবকরা আলোকবর্তিকা খুঁজে পেয়েছেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের দিকনির্দেশকারী চিন্তাধারায় এবং এই মহান চিন্তার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই ডি এস ও, এ আই ডিওয়াই ও-র নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্যে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন—'মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যারা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কোনও দিনই সংখ্যায় বেশি থাকেন না। তাঁরা সবসময়েই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক।' এই আহ্বানকে পাথেয় করেই শিক্ষা ও জনস্বার্থবিরোধী যে কোনও নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু এবং টেট সহ সমস্ত নিয়োগ পরীক্ষার দুর্নীতি বন্ধ করে সকল বেকারের চাকরি নতুবা জীবনধারণের উপযোগী বেকার ভাতার দাবিতে ২৬ নভেম্বর ছাত্র-যুবদের আইন অমান্য। কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে আন্দোলনের এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সকল জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিশ্রুতি দু'পায়ে মাড়াচ্ছে মোদি সরকার

একের পাতার পর

মধ্যে ক্যানসেল করলে কোনও টাকাই ফেরত দেওয়া হবে না। আর এ সি এবং ওয়েটিং-এর ক্ষেত্রে ট্রেন ছাড়ার সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট আগে ক্যানসেল করলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ টাকা এবং অন্য শ্রেণিতে ৬০ টাকা কেটে নেওয়া হবে। এই সময় সীমা পেরিয়ে গেলে কোনওভাবে টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে না।

মোদিজি, যাত্রীদের পকেট কাটার দারুণ ব্যবস্থা করেছেন, তাই না! কলকাতার মেট্রো রেলের যাত্রীদের ওপর আপনার সরকার আর একটা বাড়তি আঘাত হেনেছে। গত বছর মেট্রো ভাড়া প্রায় ২০০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এখন আবার ন্যূনতম ভাড়া ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মোদিজি, আপনার কাজ কি তবে হয়ে দাঁড়িয়েছে কী করে জনগণের রক্ত নিংড়ে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা এবং তা পুঁজিপতিদের পায়ে ঢেলে দেওয়া। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের দাম গত দেড় বছরে অনেকবার কমলেও আপনার সরকার পাঁচবার উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়েছে। পেট্রোলে ৯.৩৫ টাকা এবং ডিজেলে ৬.৯০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

আপনার সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অর্থনীতি বিষয়ক বৈঠকে প্রস্তাব করেছেন, যাদের গাড়ি আছে, টু হুইলার আছে বা নিজস্ব বাড়ি আছে তাদের রান্নার গ্যাসে ভরতুকি দেওয়া হবে না। কিন্তু মোদিজি, এ প্রস্তাব তো মনমোহন সিং সরকারের আমলের। সেই কংগ্রেসি প্রস্তাবকে বিজেপি কেন কার্যকর করবে? কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেই তো আপনি ক্ষমতায় বসেছেন! তা হলে আপনার শাসন কোথায় আলাদা? কংগ্রেস তার শাসনকালে যেসব জনবিরোধী নীতি নিয়েছে আপনার সরকার কি তাকেই আরও দ্রুত কার্যকর করছে না?

আসলে আপনি মুখে যাই বলে থাকুন, পুঁজির গোলাম হিসাবে আপনি যে এসব করতে বাধ্য তা আমরা আগেই বলেছি। তখন কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন আগে সময় দেওয়া হোক, উনি কি করেন দেখা যাক। আজ কী দেখা যাচ্ছে? মোদি শাসনে নতুন কিছু ফলেছে কি? একই শাসন তো চলছে। 'ওল্ড বটল, ওল্ড ওয়াইন, অনলি লেবেল নিউ'। এটাই তো হওয়ার কথা। রুল অফ ক্যাপিটালে প্রোডাক্ট তো একই হবে। মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আমরা আগেই বলেছিলাম, পুঁজির বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে মোদি বা পুঁজিপতি শ্রেণির নির্ভরযোগ্য দল হিসাবে বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ পূরণ বা সেবা করার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ক্ষমতায় যেতে পারবে না এবং ক্ষমতায় গিয়ে পুঁজির স্বার্থে রথ না ছুটিয়ে টিকতে পারবে না। বিজেপির দেড় বছরের শাসন আমাদের এই বিশ্লেষণকেই অভ্রান্ত সত্য প্রমাণ করেছে। প্রমাণ করেছে, জনগণ যদি দলের শ্রেণি চরিত্র চিনতে পারে, তবে সরকারে বসিয়ে চেনার দরকার হয় না।

অনাহারে মৃত্যু

একের পাতার পর

ম্যানেজ করে তিনদিনের বেতনে ছয় দিন কাজ করানোর কালা চুক্তি কি মালিকরা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেয়নি? বছরের পর বছর ধরে শ্রমিক শোষণের এই খেলা যদি চলতে থাকে এবং উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে তা হলে চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে দু'বেলা পেটভরে পুষ্টিকর খাবার কি শ্রমিক জোগাড় করতে পারে? তা হলে সরকার স্বীকার করুক আর নাই করুক শ্রমিক পরিবারে স্থায়ী অর্ধাহার, অনাহারই প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও যুক্তিতেই এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা যখন অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে সেই সময় কলকাতায় মিলন মেলায় সরকারের উদ্যোগে চলছে খাদ্য উৎসব। উৎসবের ব্র্যান্ড নাম দেওয়া হয়েছে 'আহারে বাংলা'। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই উৎসব বলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। 'বিশ্বের রান্না কলকাতায় খান না' বিজ্ঞাপন শুধু ব্যানার, হোর্ডিং, পোস্টারেই নয়, টিভি চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়াতেও দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষার একটি লাইন 'চেখে দেখুন, চেখে দেখুন, জিভে প্রেম নিশ্চিত'। ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে ২ নভেম্বর রাত ৯টা পর্যন্ত চলে সরকারের এই খাদ্য মোচ্ছব। মন্ত্রীরা, সরকারি নেতারা, প্রশাসনের আমলারা যখন চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চেটেপুটে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন সেই সময় অনাহারে মরছে, খিদের জ্বালায় ঘুমোতে পারছে না উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমিক। এদের শ্রমের বিনিময়ে মালিকদের সম্পদ বাড়ে, মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসন চলে। শাসকদল তার প্রসাদ পায়। শ্রমিকরা মরে অনাহারে। এই হল পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিকদেরই অনাহারে মারে না, সরকার-মন্ত্রী-আমলা সহ পুঁজির সেবকদের মানবিকতাকেও মারে। তা না হলে একদিকে যখন অনাহারে মৃত্যু অন্যদিকে তখন খাদ্য উৎসবের বিলাসিতা চলে কী করে?

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

ভি আই লেনিন

৯৮তম বার্ষিকীতে মহান নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণে সর্বহারার মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের প্রখ্যাত নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

সোভিয়েত রাজের দ্বিবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে শিরোনামায় উল্লিখিত বিষয় নিয়ে একটি অনতিবৃহৎ পুস্তিকা লেখার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের তাড়ায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের প্রাথমিক প্রস্তুতির বেশি কিছু করা এ যাবৎ হয়ে ওঠেনি। সেইজন্যই উপরোক্ত প্রশ্নে আমার মতে যা মূল কথা তার ছোট সারার্থ হাজির করার চেষ্টা করব ঠিক করেছি। বলাই বাহুল্য, বক্তব্যের সারসংক্ষেপে বহু অসুবিধা ও ত্রুটি থেকে যায়। তা হলেও একটা অনতিবৃহৎ পত্রিকা-প্রবন্ধের পক্ষে এই পরিমিত লক্ষ্যটাও হয়ত সাধ্যায়ত্ত হতে পারে, যথা ঃ প্রশ্নটির উপস্থাপন এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের আলোচনার জন্য একটা রূপরেখা অঙ্কন।

১

তত্ত্বের দিক থেকে কোনও সন্দেহই নেই যে, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট উত্তরণ পর্ব বর্তমান। সামাজিক অর্থনীতির এই উভয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সেই পর্বে মিলিত না হয়ে পারে না। এই উত্তরণ পর্বটা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও উদীয়মান কমিউনিজমের মধ্যে, বা অন্য কথায়, পরাজিত কিন্তু বিলুপ্ত না হওয়া পুঁজিবাদ আর সদ্যোজাত, কিন্তু তখনও নিতান্ত দুর্বল কমিউনিজমের মধ্যে সংগ্রামের একটা পর্ব না হয়ে পারে না।

শুধু মার্কসবাদীর কাছে নয়, বিকাশের তত্ত্ব বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে এরূপ যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির কাছেও উত্তরণ পর্বের এইরূপ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের অনিবার্যতা স্বতঃস্পষ্ট। অথচ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নিয়ে যত আলোচনা আমরা শুনি পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বর্তমান প্রতিনিধিদের কাছে থেকে (এবং নিজেদের মেকি সোস্যালিস্ট লেবেল সত্ত্বেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনিধি, ম্যাকডোনাল্ড ও জাঁ লঁগে, কাউটস্কি ও ফ্রেডরিখ অ্যাডলার সমেত সকলেই তাই), — তার বৈশিষ্ট্য হল এই স্বতঃস্পষ্ট সত্যের পরিপূর্ণ বিস্মরণ! পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, শ্রেণিসংগ্রাম পাশ কাটিয়ে যাবার স্বপ্ন, তীক্ষ্ণ খোঁচাগুলোকে মোলায়েম ও মিটমাট করার, ভোঁতা করে দেওয়ার ঝোঁক। সেইজন্যই এ ধরনের গণতন্ত্রীরা হয় পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমের উত্তরণের গোটা ঐতিহাসিক পর্বটার এতটুকু স্বীকৃতি থেকেই পালায়, নয়ত দুই যুযুধান শক্তির একটির সংগ্রাম পরিচালনার বদলে উভয় শক্তির মিটমাট ঘটাবার পরিকল্পনা বানিয়ে তোলাকেই নিজেদের কর্তব্য জ্ঞান করে।

২

আমাদের দেশের অতি গভীর পশ্চাৎপদতা ও পেটি বুর্জোয়া প্রকৃতির জন্য রাশিয়ার প্রলেতারীয় একনায়কত্বে অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় অনিবার্যভাবেই কতকগুলি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু মূল শক্তি — এবং সামাজিক অর্থনীতির মূল রূপ —রাশিয়ায় যা, সেটা যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের মতোই। তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলি আর যাই হোক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই বিদ্যমান।

সামাজিক অর্থনীতির এই মূল রূপগুলি হল ঃ পুঁজিবাদ, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন, কমিউনিজম। এই মূল শক্তিগুলি হল ঃ বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (বিশেষত কৃষক সম্প্রদায়), প্রলেতারিয়েত।

সর্বহারার একনায়কত্বের যুগে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র বলতে বোঝায় কমিউনিস্ট নীতির ভিত্তিতে ও বিশাল এক রাষ্ট্রীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ শ্রমের সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপগুলি; এ হচ্ছে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং যে পুঁজিবাদ এখনও টিকে আছে ও ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনকে ভিত্তি করে যে পুঁজিবাদ নতুন ভাবে মাথা তুলছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

রাশিয়ার শ্রম সেই পরিমাণে কমিউনিস্ট ধরনে সম্মিলিত হয়েছে যে পরিমাণে, প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটেছে এবং দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণে প্রলেতারিয় রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রীয় কৃষিতে ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে জাতীয় স্তরে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করছে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন

উদ্যোগের মধ্যে শ্রমশক্তির বণ্টন করছে, মেহনতিদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা বিপুল পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য বণ্টন করছে।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের 'প্রথম পদক্ষেপে'র কথা আমরা বলছি (১৯১৯ সালের মার্চে গৃহীত আমাদের পার্টি কর্মসূচিতেও তাই বলা হয়েছে'), কেন না এই সব শর্ত আমাদের এখানে কেবল অংশত রূপায়িত, কিংবা অন্য কথায়, এই সব শর্তের রূপায়ণ রয়েছে কেবল তার প্রাথমিক স্তরে। তৎক্ষণাৎ এক বিপ্লবী আঘাতে সেইটে নিষ্পন্ন হয়েছে, যা সাধারণভাবে তাৎক্ষণিক করা সম্ভব। যেমন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রথম দিনেই ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর, ১৯১৭) জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে বৃহৎ মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, উচ্ছেদ হয়েছে বড় বড় ভূস্বামীরা। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ পুঁজিপতি, কলকারখানা, জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ ইত্যাদির মালিকদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে বিনা ক্ষতিপূরণেই। শিল্পে বৃহৎ উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন, কলকারখানা, রেলপথের উপর 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'শ্রমিক পরিচালনায়' উত্তরণ — এটা মূলত ও প্রধানত ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে তা সবে শুরু হয়েছে ('সোভিয়েত খামার', রাষ্ট্রীয় ভূমিতে শ্রমিক রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত বৃহৎ খামার)। একইভাবে সবে শুরু হয়েছে ক্ষুদে পণ্য কৃষি থেকে কমিউনিস্ট কৃষিতে উত্তরণ হিসাবে ক্ষুদে কৃষকদের নানা ধরনের সমিতি গঠন। ব্যক্তিগত ব্যবসার বদলে দ্রব্য বণ্টনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, অর্থাৎ শহরের জন্য শস্যের এবং গ্রামের জন্য শিল্প দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও সরবরাহ। ...

কৃষি উৎপাদন ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন রূপে কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পুঁজিবাদের অতি ব্যাপক ও শক্তিশালী, অত্যন্ত দৃঢ়প্রোথিত ভিত্তি; এই ভিত্তিতেই পুঁজিবাদ টিকে থাকে পুনরুদিত হয় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নির্মমতম সংগ্রামে। এ সংগ্রামের রূপ হল, রাষ্ট্রীয় শস্য সংগ্রহের (তথা অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহেরও) এবং সাধারণভাবে দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের বিরুদ্ধে ফাটকাবাজি ও মুনাফাবাজি।

৩

এই সমস্ত বিমূর্ত তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য দেব।

'কমপ্রদ'এর (খাদ্য জনকমিশারিয়েত) তথ্য অনুসারে রাশিয়ায় শস্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহে ১৯১৭ সালের ১ আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে প্রায় ৩ কোটি পুদ। পরের বছর প্রায় ১১ কোটি পুদ। পরের বছর (১৯১৯-১৯২০) প্রথম তিন মাসের শস্য সংগ্রহ অভিযান থেকে, বোঝা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ, যেখানে ১৯১৮ সালের ঐ কয় মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) মিলেছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পুদ।

পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয়ের অর্থে এই সংখ্যাগুলি আমাদের কাজের মন্থর কিন্তু অটল উন্নয়নের পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশ্বের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলির সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে রুশি ও বিদেশি পুঁজিপতিরা যে গৃহযুদ্ধ সংগঠন করছে, তার ফলে বিশ্বে নজিরবিহীন যে দুরূহতা দেখা দিয়েছে তা সত্ত্বেও এ উন্নতিটা ঘটেছে।

তাই সর্বদেশের বুর্জোয়া এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন দালালেরা (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 'সমাজতন্ত্রী'রা) যতই মিথ্যা ও নিন্দা রটাক, এ কথা নিঃসন্দেহ ঃ প্রলেতারিয় একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের দিক থেকে আমাদের এখানে পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। সারা বিশ্বের বুর্জোয়ারা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে খেপছে ও ফুঁসছে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির আয়োজন করছে ঠিক এই কারণে যে, যুদ্ধের জোরে আমাদের দমন না করতে পারলে সামাজিক অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে আমাদের বিজয় যে অনিবার্য সেটা তারা চমৎকার বুঝেছে। কিন্তু এই উপায়ে আমাদের দমন করার চেষ্টায় তারা কৃতকার্য হচ্ছে না।

আমরা যে সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিলাম এবং বিশ্বে নজিরবিহীন যে দুরূহতার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, তার ভেতরেই পুঁজিবাদের উপর ঠিক কতটা জয় আমরা অর্জন করেছি তা দেখা যাবে পরিসংখ্যান থেকে। গোটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়, তার ২৬টি গুবের্নিয়া নিয়ে শস্যের উৎপাদন ও পরিভোগের তথ্য কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সবে প্রস্তুত করে দিয়েছে প্রকাশের জন্য। ...

অর্থাৎ, শহরগুলিকে অর্ধেক শস্য জোগাচ্ছে 'কমপ্রদ', অর্ধেক জোগাচ্ছে ফড়িয়ারা। ১৯১৮ সালে শহরের শ্রমিকদের খাদ্য বিষয়ে নিখুঁত অনুসন্ধান করে ঠিক এই অনুপাত পাওয়া গেছে। তদুপরি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া শস্যের জন্য শ্রমিকেরা যে টাকা খরচ করে সেটা ফড়িয়াদের তুলনায় ৯ ভাগের এক ভাগ। কালোবাজারি শস্যের দর রাষ্ট্রীয় দরের চেয়ে দশগুণ বেশি। শ্রমিক বাজেটের নিখুঁত অধ্যয়ন থেকে এইটে পাওয়া যায়।

৪

উদ্ধৃত তথ্যগুলি নিয়ে ভালো করে চিন্তা করলে রাশিয়ার বর্তমান অর্থনীতির সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মতো নিখুঁত মালমসলা পাওয়া যাবে।

চিরাচরিত উৎপীড়ক ও শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মেহনতিরা মুক্ত। সত্যিকারের মুক্তি ও সত্যিকারের সাম্যের এই যে অগ্রপদক্ষেপ — আয়তনে, পরিমাণে ও দ্রুততায় যা বিশ্বে অভূতপূর্ব, সে পদক্ষেপটা হিসাবে ধরে না বুর্জোয়ার সেই পক্ষপাতীরা (সেই সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও), যারা মুক্তি ও সাম্যের কথা বলে পার্লামেন্টি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থে, আর মিথ্যা করে তাকে অভিহিত করে সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র' ও 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' (কাউটস্কি-র কথায়) রূপে।

কিন্তু সত্যিকারের সাম্য, সত্যিকারের মুক্তিই (জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি) মেহনতিরা বোঝে, সেজন্যই অমন দৃঢ়ভাবে তারা সোভিয়েত রাজের পক্ষে দণ্ডায়মান।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থেকে কৃষি-প্রধান দেশে সর্বাগ্রে লাভ হয়েছে, সবেচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হয়েছে সাধারণভাবে কৃষকদের। জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমলে রাশিয়ায় কৃষকেরা না খেয়ে থাকত। আমাদের ইতিহাসের সুদীর্ঘ শতক জুড়ে কৃষকেরা এর আগে নিজেদের জন্য মেহনত করার সুযোগ পায়নি কখনও কোটি কোটি পুদ শস্য পুঁজিপতিদের দিয়ে, শহরে পাঠিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে তারা না খেয়ে থেকেছে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বেই কৃষকেরা প্রথম নিজের জন্য খাটল, শহরবাসীদের চেয়ে ভালো খেয়ে থাকল। এই প্রথম কার্যক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল কৃষকেরা — নিজেদের রুটি খাবার মুক্তি, বুভুক্ষা থেকে মুক্তি। জমির বিলিবণ্টনে সাম্য কায়েম করা হল, সবাই জানে, সর্বোচ্চ মাত্রায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা জমি বাঁটোয়ারা করছে 'পেট গুনতি করে'।

সমাজতন্ত্রের অর্থ শ্রেণি বিলোপ করা

শ্রেণির বিলোপ করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ। কর্তব্যের এই অংশটা আমরা পূরণ করেছি, কিন্তু এটা হল অংশ মাত্র, এবং সেটা সবচেয়ে দুরূহও নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রেণির

ছয়ের পাতায় দেখুন

কথার প্যাঁচে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঢাকতে পারবেন না অর্থমন্ত্রী

দেশজুড়ে বিজেপি তথা মোদি সরকারের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্র পরিচালক সহ সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল যখন খেতাব ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, তখন বিজেপির নেতারা সে সবকে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না — এমন একটা ভাব করে নেমে পড়েছেন বিজেপির দোষ স্খালন করতে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, দাদরি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বলেছেন, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিলে বা কুসংস্কারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেউ খুন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করার নেই। বলেছেন, যারা বিজেপিকে দেখতে পারে না, তারাই ধর্মীয় ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বেশি হইচই করছে। ভারতে বরাবরই সহিষ্ণুতার আদর্শ বজায় থেকেছে এবং এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদিই বরং ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার পর থেকে আদর্শগত অসহিষ্ণুতার সবচেয়ে বড় শিকার। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে দেশের স্থিতি নষ্ট হচ্ছে বলে যখন দেশের সচেতন মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তখন জেটলি সাহেবের আক্ষেপ— এই সব প্রচারেই বরং মোদিজির উন্নয়নের রথ আটকে গিয়ে দেশের মুখ পুড়ছে।

এর দ্বারা প্রথমত, তিনি দাদরিতে গোমাংস রাখার মিথ্যা অভিযোগে মহম্মদ আখলাককে হত্যার দায় অস্বীকার করছেন। এ ব্যাপারে বিজেপির যে কোনও দায় নেই, তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার মুখ নরেন্দ্র মোদিকে আড়াল করতে চেয়েছেন এবং সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে গো-মাংস বিতর্ক উসকে দিয়ে বিজেপি নেতারা যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘৃণ্য কৌশল নিয়েছেন, তাকেও ঢাকতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন হল, দাদরি যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় তাহলে তার পরপরই উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হল কেন? হিমাচলপ্রদেশে ট্রাকে মৃত গরু নিয়ে যাওয়ার কারণে পিটিয়ে হত্যা করা হল কেন এক নিরীহ যুবককে? মৈনপুরিতে গরু হত্যা করা হয়েছে গুজব ছড়িয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হাজার হাজার লোক জড়ো করে মুসলিম চর্ম ব্যবসায়ীদের উপর নৃশংস আক্রমণ করা হল কেন? তারপরই বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হল কেন? সেখানকার পুলিশ অফিসার বলেছেন, দুষ্কৃতীরা গেরুয়া পোশাক পরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে এই ধ্বংসযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছে। এ সব প্রশ্নের জবাব অর্থমন্ত্রীকে দিতে হবে না?

ভারতের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেই চলেছে— এই তথ্য অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে মানুষকে জানতে হবে না। ঘৃণ্য কৌশলে কারা তা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তাও মানুষের অজানা নয়। বরং এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করার কোনও প্রতিশ্রুতি অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনলে তাঁরা খুশি হতেন।

২০০২ সাল থেকে গুজরাট দাঙ্গায় মোদির হাত রক্তাক্ত, তারপর ছোট বড় বহু দাঙ্গাই বিজেপি-আর এস এসের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। স্বভাবতই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। একেই 'আদর্শগত অসহিষ্ণুতা' বলে অর্থমন্ত্রী উড়িয়ে দিতে চাইছেন? দেশের মানুষ তা মেনে নেবে এ কথা বিজেপি নেতারা ভাবছেন কী করে? কংগ্রেসের কুশাসন দেখে এবং সংবাদমাধ্যমের ফোলানো-ফাঁপানো প্রচারে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে যারা বিজেপিকে ত্রাতা এবং নরেন্দ্র মোদিকে মসিহা ভেবেছিলেন, তাঁদের মোহ অতি দ্রুত ভাঙছে। মোদিজির ইমেজ তলানিতে। তাই উন্নয়নের বুলি ঝুলিতে পুরে বিজেপি নেমেছে চরম সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অ্যাজেন্ডা নিয়ে।

অর্থমন্ত্রী যত কৌশলেই বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতি ঢাকতে চান, তার পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। দেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানী চলচ্চিত্রকার সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দেশ জুড়ে এই রাজনীতির বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছেন। আজ প্রয়োজন দেশের মানুষকে যুক্ত করে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণআন্দোলন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে যথার্থ বামপন্থীদেরই, কোনও মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলের দ্বারা এ কাজ হবে না।

বিজেপি মনে করে নষ্টের গোড়া মহিলারাই

বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে দশম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে বেকার সমস্যার জন্য দায়ী করা হয়েছে মহিলাদের। বলা হয়েছে চাকরিজীবী মহিলাদের জন্যই বেকারসমস্যা তীব্র রূপ নিয়েছে। এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার, বিজেপি চায় না মহিলারা রান্নাঘর তথা বাড়ির বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে সমান যোগ্যতায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক।

বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয়ে শুধু তারা নারীবিদ্বেষী ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে তা নয়, শিক্ষার অবনমনের জন্যও তারা দায়ী করেছে শিক্ষিকাদের। সম্প্রতি গুজরাট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অবনমন নিয়ে যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শিক্ষিকারা মাতৃত্বকালীন ছুটি নেন বলে দীর্ঘসময় স্কুলে পড়াতে পারেন না। ফলে শিক্ষার অবনমন ঘটছে।

এই চিন্তা আধুনিক ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তা না হলে বিজেপি নেতারা দেখতে পেতেন বিশ্বের সর্বত্র মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়। সেই সময়ের জন্য সাময়িক ভাবে কর্মী নিয়োগের বিধি রয়েছে। তা করলেই যে সমস্যা মিটে যায় গুজরাটের বিজেপি সরকারের কি তা জানা নেই? আসলে প্রাচীন মনুবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন বিজেপি সরকারের কর্তাদের কাছে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক, পিছিয়ে-পড়া ধারণা যে গ্রহণযোগ্য হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই গুজরাটের পাঠ্য বইয়ে অবাধে স্থান পায় এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য।

বিজেপি সরকারের এই নারী বিদ্বেষী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। ২ নভেম্বর সংগঠনের গুজরাট রাজ্য আহ্বায়ক কমরেড মীনাক্ষী যোশী এক বিবৃতিতে বলেছেন, রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার অবনমনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে মহিলা শিক্ষকদের দায়ী করা হয়েছে। তিনি এই রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানান।

টিভি চ্যানেলে জ্যোতিষীদের দেখা মেলে, বিজ্ঞানীদের নয়

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর

(সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার 'এই সময়' পত্রিকায় ৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। তার কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হল।)

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় যে আমরা পড়ুয়াদের একটা প্রশস্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে ব্যর্থ? কারণ কী হয়, মাঝে মধ্যে কোনও একটা বিশেষ ক্ষেত্র হয়ত খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। সবাই তখন সেটা নিয়েই এগোতে চায়। সেখানে প্রশস্ত বিজ্ঞান চর্চাটার কোনও অভাব বোধ করছি আমরা?

উত্তর ঃ আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু বাধ্যবাধতার কারণে হয়তো তেমনটা ঘটছে। সেটাতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। কখনও কখনও আমাদের সংবাদমাধ্যম এমন কিছু খবরকে গুরুত্ব দেয়, যেগুলো হয়তো বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক নয়। যেমন ধর, আজ যদি হকিং অন্য গ্রহের প্রাণীদের সম্পর্কে কিছু বলেন, অমনি হই চই পড়ে যায়। কিন্তু হকিং প্রায় কয়েক বছর অন্তর মত বদলান!

প্রশ্ন ঃ তা হলে আপনি ওঁর অ্যালিয়েন থিওরিকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না?

উত্তর ঃ আমি সত্যিই এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য খুব সময় দিতে পারি না। (হেসে) নিশ্চয় তাঁর এইসব কথা বলার কোনও কারণ রয়েছে। কিন্তু এটা আমাদের বিজ্ঞানের গবেষণাকে তো খুব প্রভাবিত করছে না!

প্রশ্ন ঃ আপনি বিজ্ঞানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষকও। আমার মনে আছে আইউকা (আইইউসিএএ)-তে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে বিজ্ঞান দিবস পালিত হত। আপনার কি মনে হয় এ দেশের গবেষণাগারে বসে জনপরিসর থেকে অনেকটা দূরে থেকে গবেষণা করার চাইতে, সেই গবেষণা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে তা নিয়ে আরও ভাবনা চিন্তা হওয়া দরকার? যাতে সাধারণ মানুষকে ঠিক সময়ে মৌলিক গবেষণায় আকৃষ্ট করা যায়?

উত্তর ঃ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার করা খুবই জরুরি। আমি চাইব আমার সতীর্থরা সবাই আরও বেশি করে এ নিয়ে কাজ করুন। অবশ্যই সব সময় নয়, কিন্তু নিজেদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি তাঁরা পাঁচ থেকে দশ শতাংশ সময় দিয়ে লেখালেখি বা দূরদর্শনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, অন্যদের বোঝাতে পারেন তো ভালো হয়। এটা হওয়াই উচিত। তবে শুধু বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব নয়, এখানে গণমাধ্যমকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা কিন্তু এটা সাধারণত করেন না। প্রতিটি টিভি চ্যানেলে একজন জ্যোতিষীকে দেখা যায়, কিন্তু কোনও বিজ্ঞানী নেই।

প্রশ্ন ঃ সাধারণত আমরা দেখি যে, কোনও বিশেষ ঘটনার সময় বিজ্ঞানীরা টি ভি তে আসেন (যেমন সূর্য গ্রহণ) কিন্তু নিয়মিত নয়। একটা ধারণা আছে যে, রোজ টি ভিতে বিজ্ঞান দেখালে বা কাগজে লিখলে সেটা সাধারণ মানুষ বুঝবে না। কাজেই কেউ দেখবে বা পড়বে না। বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করতে কি কিছু করা যায়?

উত্তর ঃ বিজ্ঞান একটি ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া। যেখানে সব সময় কিছু যোগ হচ্ছে, সংশোধন হচ্ছে। আমরা নতুন কিছু জানছি, শিখছি, বুঝছি। এই প্রক্রিয়াটা দর্শকের কাছে তুলে ধরা দরকার। বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তার জগৎ থেকে ভাবেন, সেখান থেকে কিছু ফলাফল পেতে চান। তাঁরা কী নিয়ে গবেষণা করছেন, তাতে কী ফলাফল পাওয়ার আশা করছেন সেটা জনগণকে সহজভাবে জানানো উচিত। যাতে জনগণ পরে বিজ্ঞানীদের কাজ নিয়ে, বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে, তাঁদের প্রশ্ন করতে পারেন, যা তাঁরা আশা করেছিলেন, তা তাঁরা পেলেন কি না। বহু বছর আগে আমি চন্দ্রশেখরের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি তখন একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। ১৯৩০-এ যখন পালোমার-এ ৩০ ইঞ্চি দূরবীন বসাচ্ছেন হাবল আর এডিংটন, তখন তাঁদের এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই যন্ত্র দিয়ে তাঁরা কী দেখতে চাইছেন। হাবল বলেন যে — কী দেখতে চাইছি, সেটা জানা থাকলে তো আর টেলিস্কোপটা বানানোর দরকার হত না। আজকাল অনেক সময় আমরা উত্তরটা আগেই ভেবে রাখি, পরীক্ষা করে সেটা নিশ্চিত করি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তাতে বিষয়টা একটা অচলায়তনে পরিণত হয়। তুমি কী দেখতে চাও, সেটা তুমি আগে থেকে ঠিক করে রাখলে সেই সম্ভাবনার জায়গাগুলি বন্ধ করে রাখা হয়। যন্ত্র দিয়ে তুমি বিষয়টাকে শুধুমাত্র নিশ্চিত করলে। নতুন কিছু আবিষ্কারের যে আনন্দ, আমার মনে হয় জনসাধারণের কাছে এর স্বাদ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তা হলে তাঁরা বিজ্ঞানের প্রকৃত নির্যাসটা বুঝতে পারবেন। আর বিজ্ঞানীদেরও সেই সম্ভাবনার দরজাগুলি রাখা উচিত।

প্রশ্ন ঃ আজকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ আর বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে মানুষ প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে। শেষ সায়েন্স কংগ্রেসে বৈদিক বিজ্ঞান নিয়ে একটা গবেষণাপত্রও পড়া হয়েছে। সেখানে 'বৈমানিক প্রকরণম' থেকে উদ্ধৃতিও তোলা হয়েছে। বিজ্ঞানের গেরুয়াকরণ নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ তিনটেই আলাদা জিনিস। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি শাখা যা পরীক্ষিত সত্যের উপর নির্মিত। জ্যোতিষ একটা বিশ্বাস, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বৈদিক বিজ্ঞান নিয়ে যে গবেষণাপত্রটি পড়া হয়েছে, সেটা পুরাণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। বলা হচ্ছে, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানতাম। কিন্তু সেটা শুধু মাত্র একটা বিশ্বাস। এখন সেটাই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাকে গ্রাস করে নিলে তা অত্যন্ত দুঃখের হবে। ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে হলে, সেটা নিয়ে সৎ গবেষণা হওয়া দরকার। সেটা পরে আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োজনে নিতেই পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত চর্চা হতেই পারে, কিন্তু এটা গবেষণার মূল বিষয় নয়। মৌলিক বিজ্ঞানচর্চাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

গণহত্যাকারী টনি ব্লেয়ারের ভুল স্বীকারও মিথ্যাচার

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ইরাক আক্রমণের সাথী হয়েছিলেন। সম্প্রতি মার্কিন একটি টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তাঁদের ইরাক আক্রমণের জন্যই আজ জঙ্গি সংগঠনগুলি ইরাকে মাথাচাড়া দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় মৌলবাদীদের জঙ্গি কার্যকলাপে ইউরোপে শরণার্থী সমস্যা তৈরি হয়েছে। কার্যত তিনি দায় স্বীকার করেছেন। আবার বলেছেন, ইরাকের সরকারকে উচ্ছেদ করলে যে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁরা কোনও অন্যায় করেননি। বলেছেন, 'এই ২০১৫ তেও সাদ্দাম আছে, তার থেকে সাদ্দাম নেই এই পরিস্থিতি ভাল'। একদিকে তিনি বলছেন তাঁদের ইরাক নীতির জন্য শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়েছে। আবার ইরাকের শাসন উচ্ছেদের সাথে সাদ্দাম অপসারণের কোনও যোগসূত্র তিনি পাচ্ছেন না।

এ কী ধরনের দ্বিচারিতা! আদৌ কি তিনি কোনও ভুল স্বীকার করতে চেয়েছেন? নাকি এ ভণ্ডামি? যে ইরাক আক্রমণে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে, কয়েক কোটি মানুষের জীবনে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে সেই ইরাক আক্রমণের জন্য তিনি কোনও অনুতাপ প্রকাশ করেননি। সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক।

গত ১২ বছরে ব্লেয়ার যেখানেই গেছেন সেখানেই যুদ্ধ অপরাধীর তকমা তাঁর পিছন ছাড়েনি। মানুষ বুশ-ব্লেয়ারের ভূমিকাকে ভুলে যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতদিন তিনি এই পথে হাঁটেননি। কিন্তু কয়েকদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সামনে হিলারি ক্লিন্টনের মেল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যাতে ব্লেয়ারকে ক্ষমা চাওয়ার ভানটুকু অন্তত করতে হয়েছে।

সন্তানহারা মায়ের হাহাকারে ভরে আছে ইরাকের আকাশ বাতাস

ফাঁস হয়ে যাওয়া মেল থেকে জানা গেছে ইরাকে আক্রমণ চালানোর জন্য বুশকে সবুজ সংকেত যখন জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার প্রায় বছরখানেক আগেই তার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য ব্লেয়ার পার্লামেন্টের মতামতের কোনও তোয়াক্কাই করেননি। বরং ইরাক আক্রমণের কয়েকদিন আগে ইরাকে কত গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে তার রিপোর্ট দাখিল করে একটি 'ডশিয়ার' বা ফাইল প্রকাশ করেন তিনি। এই ডশিয়ারে প্রকাশিত জৈব-রাসায়নিক তথা নানা ধরনের মারণাস্ত্রের তালিকা দেখিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে হইচই ফেলে দেন ব্লেয়ার। ব্রিটিশ সাংসদরা তখনই ব্লেয়ারকে যুদ্ধে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে দেন। পরবর্তী কালে বুশ-ব্লেয়ারের মিলিত তাণ্ডবে ইরাক দেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন ব্লেয়ার বলছেন তাঁর অস্ত্র পরীক্ষক দল তাঁকে ভুল তথ্য দিয়েছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যাক, এই অস্ত্র পরীক্ষক দল কী বলছে। ইরাকের অস্ত্র ভাণ্ডার নিয়ে যে তথ্য দিয়েছিলেন ব্লেয়ার তাঁর সেই 'ডশিয়ার'-এ, তা কত দূর সত্য, সেই সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে বার করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী দলের প্রধান স্যার ডন চিলকোট। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যাবে ব্লেয়ারের সেই বিখ্যাত ডশিয়ারের দেওয়া তথ্য আদৌ সত্য ছিল না। তাই আগেভাগে তিনি সাফাই দেওয়ার কাজ সেরে রাখছেন বলে কথা উঠেছে। ইতিমধ্যেই যতটুকু সংবাদ এই বিতর্কে প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে অস্ত্র পরীক্ষক দল ইরাকের অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কোনও উল্লেখ ছিল না। যে অস্ত্র তারা দেখেছিল তার ক্ষমতাকে তারা বলেছিল, 'স্পোরাডিক অ্যান্ড প্যাচি'। রাষ্ট্রসংঘের পরীক্ষক দলের প্রধান ড. হ্যান্স ব্লিক্স যুদ্ধের তিনমাস আগে ইউ এন সিকিউরিটি কাউন্সিলে জানিয়েছিলেন, বেশ কিছু নিষিদ্ধ অস্ত্রের কথা জানা যাচ্ছে, তার ক্ষমতা কী, তা কোথায় আছে, আদৌ আছে কি না, তা জানা নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, এই অস্ত্রভাণ্ডারের কথা শুনে কারওর যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

ব্রিটিশ সরকারি জৈব যুদ্ধাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডেভিড কেলি ব্লেয়ারের ডশিয়ারে প্রকাশিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ইরাকে জৈব অস্ত্রের ল্যাবরেটরি আছে বলে ব্রিটিশ সরকার দাবি করেছিল। সেই দাবি ঠিক নয় বলে তিনি বলেছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সেই খবর প্রকাশ করায় তার জেরে প্রবীণ এই বিজ্ঞানীকে নিহত হতে হয়েছিল। ব্লেয়ার সরকার এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করলেও রীতিমতো প্রশ্ন উঠে যায় ব্রিটেনে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ইরাক যুদ্ধের সময়ের যে সব তথ্য ফাঁস হয়েছে, ২০০২-এর মার্চে লিখিত তার একটিতে জানা গেছে, তৎকালীন মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল জর্জ বুশকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখছেন, 'ইরাকে ব্লেয়ার আমাদের সাথে আছে। সামরিক হস্তক্ষেপ দরকার।... তিনি দুটি বিষয়ে একমত। (গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর ইরাকের আক্রমণের) হুমকি সত্য। সাদ্দামকে পরাস্ত করার অর্থ ওই অঞ্চলের উপর আরও অধিকার কায়েম।' অথচ সেই সময় ইরাক আক্রমণ নিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ব্লেয়ারের বক্তব্য ছাপছে, 'সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা এখনই সামরিক হস্তক্ষেপের কথা বলছি না।'

দ্বিচারিতার কোনও মাত্রা নেই। দেশের অধিকাংশ যুদ্ধবিরোধী জনগণকে জানাচ্ছি এখনই যুদ্ধে যাচ্ছি না। আর তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে রাখছি। যুদ্ধবাজ মার্কিন দোসরকে কথা দিয়ে রাখছি।

ব্রিটিশ তরুণ রেজ কেইস ইরাক যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এত মানুষের অকারণে প্রাণ চলে গেল! এর আবার ক্ষমা হয় নাকি? ইরাকে যাওয়ার পিছনে আমাদের কারণ ছিল গণবিধ্বংসী অস্ত্র। সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করা নয়।' সাধারণ মার্কিন বা ব্রিটিশ সৈন্যকে এই কথা বলেই যুদ্ধের পক্ষে দাঁড় করানো হয়েছিল। গোটা বিশ্বের বিবেককেও এইভাবে সাদ্দামের বিরুদ্ধে চালিত করা হয়েছিল।

ইরাকে অ্যাংলো-মার্কিন আক্রমণের আগে ১২ বছর অর্থনৈতিক অবরোধ চালানো হয়েছে। ইরাককে ভাতে মেরে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি কব্জা করতে চেয়েছিল বুশ-ব্লেয়ার। তা পারেনি। শেষ পর্যন্ত গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা ধুয়ো তুলে যুদ্ধ শুরু করল। এই যুদ্ধের আগে রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্র পরীক্ষক দল বারবার ইরাক গেছে। কোনও অস্ত্রের সন্ধান তারা পায়নি। হঠাৎ ব্লেয়ার সেই অস্ত্রের সন্ধান দিলেন তাঁর পার্লামেন্টকে।

আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ খুব প্রয়োজন। যতবার তারা আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে ততবার যুদ্ধের পথেই তাদের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা দেখা গেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে চূড়ান্ত আর্থিক মন্দার কথা আমাদের জানা আছে। কত মানুষের প্রাণ গেছে। পরিবারের পর পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। এর বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রের ভাণ্ডার খালাস হয়েছে। নতুন অস্ত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু মন্দা তাদের পিছু ছাড়েনি। বিশ্ব অর্থনীতির চাকা মাটির এত গভীরে ঢুকে গেছে তাকে চলমান করার সাধ্য কোনও সাম্রাজ্যবাদীদেরই নেই।

ব্লেয়ার ভুল স্বীকারের ভণ্ডামি করুক, বা নিজেদের ভুলকে সামরিক বা রণনীতিগত ভুলের তকমা দিতে চাক, সার্বভৌম দেশ আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে গোটা অঞ্চলে এত বছর ধরে মারণযজ্ঞ শুরু করার দায়ে বহু আগেই মানুষ তাদের যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেছে। আস্তিনের রক্তের দাগ তাদের উঠবে না। এর দায় থেকে তাদের মুক্তি নেই।

মাও সে-তুং-এর প্রেরণায় ওষুধ আবিষ্কার চিনের বিজ্ঞানীর

এ বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন চিনা বিজ্ঞানী তু ইয়ুইয়ু। ম্যালেরিয়ার ওষুধ আরটেমিসিনিন আবিষ্কার করেছেন তিনি। তাঁর এই আবিষ্কারটি জড়িয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক চিনের রূপকার মহান বিপ্লবী মাও সে-তুংয়ের এক মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে।

১৯৬৭ সালের কথা। চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ তখন শীর্ষে পৌঁছেছে। সেই সময় ভিয়েতনামের প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী নেতা হো চি মিন একটি সাহায্য চেয়েছিলেন চিনের চেয়ারম্যান মাও-এর কাছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তখন প্রবল লড়াই চলছে ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের। হো চি মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট যোদ্ধারা রক্ত ঝরাচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধারের লক্ষ্যে। প্রবল শক্তিধর শত্রুর সাথে সাথে মারণ রোগ ম্যালেরিয়ার সঙ্গেও লড়াই চালাতে হচ্ছিল কমিউনিস্ট বাহিনীকে। এ বিষয়েই মাও-এর সাহায্য চেয়েছিলেন হো চি মিন। অনুরোধ করেছিলেন চিনের প্রাচীন প্রথাগত চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের জন্য মাও যেন গবেষণার ব্যবস্থা করেন।

সেই অনুরোধ মেনে মাও সে-তুংয়ের নির্দেশ মতো ১৯৬৭-এর ২৩ মে ম্যালেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণার কাজ শুরু হয় চিনে। অবশ্য মাও সে-তুংয়ের মৃত্যুর পরে ১৯৮১ সালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে গবেষক তু ইয়ুইয়ু নতুন করে প্রাচীন চৈনিক প্রথাগত পথে ম্যালেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের কাজ শুরু করেন। মাও সে-তুং-এর ১৯৬৭ সালে দেখানো পথই প্রেরণা দেয় তু-কে। আবিষ্কৃত হয় আরটেমিসিনিন। সেই সূত্রেই এবার নোবেল পেলেন তিনি।

মার্কসবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ হল দুনিয়ার যে কোনও অংশের মেহনতি মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক চিন সেদিন ঠিক এই কাজটাই করেছিল। তু ইয়ুইয়ুর নোবেলপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে এমনকী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিও সেই বিষয়টি নতুন করে সামনে না এনে পারেনি।

হাওড়ায় নারীনিগ্রহ বিরোধী কমিটির বিক্ষোভ

নিখোঁজ হওয়ার পরদিন ৮ আগস্ট হাওড়ার শ্যামপুর থানার কুর্চিবেড়িয়া গ্রামের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃতদেহ মেলে রাস্তার পাশের একটি খালে। মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ থানায় দায়ের করেন তার বাবা-মা সহ গ্রামের মানুষ। কিন্তু প্রায় তিন মাস পার হতে চললেও পুলিশ তদন্ত করে কাউকে গ্রেফতার করেনি। এর প্রতিবাদে ২ নভেম্বর শ্যামপুর নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে মৃত মেয়েটির পরিজন সহ এলাকার মানুষ উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাতে যান। আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও মহকুমা শাসক অনুপস্থিত থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে দফতরের সামনে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। পথচলতি বহু মানুষও বিক্ষোভে সামিল হন। দফায় দফায় প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পর মহকুমা শাসকের দফতর থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন কমিটির রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে কল্পনা দত্ত ও রুনা পুরকাইত এবং স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষে মিনতি সরকার, জয়ন্ত খাটুয়া প্রমুখ।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

তিনের পাতার পর

বিলোপের জন্য, দরকার শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ, সবাইকেই শ্রমজীবী করে তোলা। সেটা সঙ্গে সঙ্গেই করা চলে না। এ এক এমন দুরূহ কাজ যার তুলনা নেই এবং যা সমাধা করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কোনও রকমে একটা শ্রেণির উচ্ছেদ করে এ কর্তব্যের সমাধান সম্ভব নয়। তার সমাধান সম্ভব কেবল সমস্ত সামাজিক অর্থনীতির সাংগঠনিক পুনর্নির্মাণ মারফত। একক-বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র পণ্য অর্থনীতি থেকে সামাজিক বৃহদায়তন অর্থনীতিতে এরূপ উত্তরণ মারফত। উত্তরণ অনিবার্যভাবেই একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। তাড়াহুড়া ও অসতর্ক প্রশাসনিক-সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সে উত্তরণ কেবল বিলম্বিত ও দুরূহই হবে। এ উত্তরণ ত্বরান্বিত করা যায় কৃষকদের কেবল এমন সাহায্য দিয়ে, যার কল্যাণে বিপুল মাত্রায় সমস্ত কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন, তার আমূল পুনর্গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

কর্তব্যের দ্বিতীয় দুরূহতম অংশটার সমাধান করতে হলে বুর্জোয়ার উপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে তার রাজনীতির নিম্নরূপ মূলধারা অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে। মালিক কৃষক থেকে মেহনতি কৃষকদের, ব্যবসায়ী কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের, মুনাফাকারী কৃষক থেকে খাটিয়ে কৃষকদের তফাৎ করতে হবে, সীমারেখা টানতে হবে।

এই পার্থক্য নিরূপণ করার মধ্যেই রয়েছে সমাজতন্ত্রের সমস্ত মর্মার্থ।

এবং অবাক হবার কিছু নেই যে মুখে সমাজতন্ত্রী ও কাজে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মার্তভ ও চের্নোভরা, কাউট্স্কি অ্যান্ড কোং) সমাজতন্ত্রের এই মর্মার্থ বোঝেন না।

উল্লিখিত এই সীমারেখা টানা অতি দুরূহ, কেন না বাস্তব জীবনে কৃষকদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাক, যত বৈপরীত্যই থাক, তা সবই এক সমগ্রে নিহিত। তা হলেও সীমারেখা টানা সম্ভব এবং শুধু সম্ভবই নয়, বরং কৃষক অর্থনীতি ও কৃষক জীবনযাত্রার পরিস্থিতি থেকেই তা অনিবার্যরূপে বেরিয়ে আসে। যুগের পর যুগ মেহনতি কৃষকদের পীড়ন করেছে জমিদার, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, কালোবাজারি ও তাদের রাষ্ট্র — সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও তার অন্তর্গত। যুগের পর যুগ ধরে মেহনতি কৃষকেরা এই সব পীড়ক ও শোষকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এসেছে এবং জীবন থেকে পাওয়া এই 'শিক্ষায়' কৃষকেরা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্য সন্ধানে বাধ্য হচ্ছে। অথচ সেই সঙ্গেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে, পণ্য অর্থনীতির পরিস্থিতির ফলে অনিবার্যভাবেই কৃষকেরা (সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) পরিণত হচ্ছে ফড়িয়া ও মুনাফাবাজে।

উল্লিখিত এই পরিসংখ্যান থেকে মেহনতি কৃষক ও মুনাফাবাজ কৃষকদের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার যে সব ত্রুটি সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণির সরকার ভালোই সচেতন, কিন্তু সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পর্বে যা দূর করা সম্ভব নয়, সে সব ত্রুটি সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির হাতে বাঁধা রাষ্ট্রীয় দরে এই যে কৃষক ১৯১৮-১৯১৯ সালে শহরের ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের জন্য ৪ কোটি পুদ শস্য দিয়েছিল — এই কৃষক হল মেহনতি কৃষক, সোস্যালিস্ট-শ্রমিকদের পূর্ণাধিকারী সতীর্থ, তার সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী, পুঁজির জোয়ালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সহোদর ভাই। আর ঐ যে কৃষক শহরের শ্রমিকদের টানাটানি ও বুভুক্ষার সুযোগ নিয়ে, রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে, সর্বত্র প্রতারণা-লুণ্ঠন-জালজুয়াচুরি বাড়িয়ে তুলে ও তার পুনর্জন্ম দিয়ে গোপনে গোপনে ৪ কোটি পুদ শস্য বিক্রি করেছে রাষ্ট্রীয় দরের দশ গুণ বেশি দামে, এই কৃষক হল কালোবাজারি,পুঁজিপতির সহযোগী, এ হল শ্রমিকদের শ্রেণিশত্রু, এ হল শোষক। কেন না উদ্বৃত্ত শস্য হাতে থাকা, যা আহরিত হয়েছে সর্বরাষ্ট্রীয় ভূমি থেকে এবং এমন কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে যার সৃষ্টিতে কোনও না কোনও ভাবে শুধু কৃষক নয়, শ্রমিক এবং অন্যান্যদের শ্রমও ঢালা হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত শস্য রাখা ও তা নিয়ে কালোবাজারি করার অর্থ ক্ষুধার্ত শ্রমিকের শোষকে পরিণত হওয়া।

আমাদের সংবিধানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে অসাম্য, সংবিধান সভার ভাঙন, উদ্বৃত্ত শস্যের জবরদস্তি আদায় প্রভৃতির দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাদের চারিদিক থেকে চিৎকার ওঠে, তোমরা স্বাধীনতা, সমতা ও গণতন্ত্রের লঙ্ঘনকারী। আমরা জবাই দিই ঃ মেহনতি কৃষকেরা যুগের পর যুগ যাতে জর্জরিত হয়েছে সেই বাস্তব অসাম্য, সেই বাস্তব স্বাধীনতাহীনতা বিলোপ করার জন্য আমাদের মতো এতখানি করেছে এমন রাষ্ট্র দুনিয়ায় নেই। কিন্তু কালোবাজারি কৃষকের সঙ্গে সমতা আমরা কখনও মানি না, যেমন মানি না শোষকের সঙ্গে শোষিতের, ভুরিভোজীর সঙ্গে ক্ষুধার্তের 'সমতা', দ্বিতীয়কে লুঠ করার জন্য প্রথমের 'স্বাধীনতা'। এবং যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি এই পার্থক্যটা বুঝতে চান না, তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, কাউট্স্কি, চের্নোভ, মার্তভ বলে অভিহিত করলেও তাঁদের আমরা শ্বেতরক্ষী বলেই দেখব।

৫

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য শ্রেণির বিলোপ করা। এই বিলোপের জন্য প্রলেতারিয় একনায়কত্ব যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু অবিলম্বেই শ্রেণির বিলোপ সম্ভব নয়।

প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যুগ ধরে শ্রেণি আছে ও থাকবে। শ্রেণি যখন লোপ পাবে, তখন একনায়কত্বের প্রয়োজন থাকবে না। শ্রেণি লোপ পাবে না প্রলেতারিয় একনায়কত্ব ছাড়া।

শ্রেণি থেকে গেছে, কিন্তু প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যুগে প্রত্যেক শ্রেণিরই রূপান্তর ঘটেছে ; বদলেছে পারস্পরিক সম্পর্কও। প্রলেতারিয় একনায়কত্বের আমলে শ্রেণিসংগ্রাম লোপ পায় না, অন্য রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র।

পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েত ছিল নিপীড়িত শ্রেণি, উৎপাদনের উপায়ের উপর সর্ববিধ মালিকানা-বর্জিত শ্রেণি, এমন একমাত্র শ্রেণি যা সরাসরি ও

জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমলে রাশিয়ায় কৃষকেরা না খেয়ে থাকত। আমাদের ইতিহাসের সুদীর্ঘ শতক জুড়ে কৃষকেরা এর আগে নিজেদের জন্য মেহনত করার সুযোগ পায়নি কখনও ঃ কোটি কোটি পুদ শস্য পুঁজিপতিদের দিয়ে, শহরে পাঠিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে তারা না খেয়ে থেকেছে। প্রলেতারিয় একনায়কত্বেই কৃষকেরা প্রথম নিজের জন্য খাটল, শহরবাসীদের চেয়ে ভালো খেয়ে থাকল। এই প্রথম কার্যক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল কৃষকেরা...

সমগ্রভাবে ছিল বুর্জোয়ার বিপরীতে এবং তাই একমাত্র সেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী হবার ক্ষমতা ধরেছিল। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়াল শাসক শ্রেণি। সে স্বহস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রেখেছে, ইতিমধ্যেই সামাজিক উৎপাদনের উপায়ের ব্যবস্থাপনা করছে, দোদুল্যমান, অন্তর্বর্তী অংশ ও শ্রেণিগুলিকে সে গাইড করছে, শোষকদের প্রতিরোধের বর্ধিত উদ্যোগকে সে দমন করছে। এ সবই হল শ্রেণিসংগ্রামের বিশেষ কর্তব্য —এমন কর্তব্য যা প্রলেতারিয়েত আগে হাজির করেনি ও করতে পারত না।

শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শ্রেণি বিলুপ্ত হয়নি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বে সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলুপ্ত হতে পারে না। শোষকেরা পরাজিত কিন্তু নির্মূল হয়নি। তাদের রয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ঘাঁটি, আন্তর্জাতিক পুঁজি, যার একটা শাখা হল তারা। কিছু কিছু উৎপাদনের উপায়ের অংশ বিশেষ তাদের রয়ে গেছে, রয়েছে টাকা, রয়েছে বিপুল সামাজিক যোগাযোগ। পরাজিত হওয়ার ফলেই তাদের প্রতিরোধের উদ্যোগ বেড়ে উঠেছে শত গুণ, হাজার গুণ। রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক পরিচালনা 'বিদ্যায়' তারা খুবই দক্ষ। তারা জনসংখ্যার যেটুকু অংশ তার চেয়ে তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। শোষিতদের বিজয়ী অগ্রবাহিনীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত শোষকদের শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতা ও কঠোরতায় হয়ে উঠেছে তুলনাহীন। কিন্তু যদি বিপ্লবের কথা বলতে হয়, যদি সংস্কারবাদী মোহ দিয়ে তার অর্থ বদলে দেওয়া না হয় (যা করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত বীরেরা), তা হলে এটা না হয়ে যায় না।

শেষত, সাধারণভাবে সমস্ত পেটি বুর্জোয়ার মতোই কৃষক সম্প্রদায় প্রলেতারিয় একনায়কত্বের আমলেও একটা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। একদিকে এরা হল মেহনতিদের একটা বেশ বড় (এবং পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় বিপুল) অংশ, যারা জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য মেহনতিদের সাধারণ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে এরা হল বিচ্ছিন্ন ক্ষুদে উৎপাদক, সম্পত্তিমালিক ও ব্যবসায়ী। এরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে দোদুল্যমানতা জাগে। এবং এই শেষোক্ত দুইয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের অবিশ্বাস্য রকমের ভাঙনের ক্ষেত্রে, পুরাতনের প্রতি, গতানুগতিকের প্রতি, অপরিবর্তনীয়তার প্রতি এই কৃষক ও সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়াদের অত্যধিক আসক্তির ক্ষেত্রে এ তো স্বাভাবিক যে, এদের মধ্যে একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষে যাওয়া, দোদুল্যমানতা, ডিগবাজি, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি দেখে যেতে থাকব।

এই শ্রেণি বা এই সব সামাজিক অংশগুলির প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল তাদের গাইড করা, তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করা। দোদুল্যমান ও অস্থিরমতিদের নিজেদের দিকে টেনে আনা —এই হল প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য।

যদি আমরা সমস্ত মূল শক্তি বা শ্রেণির এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্বের ফলে তাদের পরিবর্তিত পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনা করি, তা হলে দেখব, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনিধিদের বেলায় যা দেখি, সাধারণভাবে 'গণতন্ত্রের মাধ্যমে' সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রচলিত পেটি বুর্জোয়া ধারণাটা কী অসম্ভব রকমের তাত্ত্বিক গাঁজাখুরি, কী নির্বুদ্ধিতা। 'গণতন্ত্র' অ্যাবসলিউট এবং শ্রেণি উর্ধ্ব, বুর্জোয়ার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বদ্ধমূল ধারণা — এই হল এ ভ্রান্তির ভিত্তি। আসলে প্রলেতারিয় একনায়কত্বে গণতন্ত্রও উত্তীর্ণ হয় একেবারেই নতুন একটা পর্যায়ে এবং সমস্ত ও সর্ববিধ রূপকে স্বীয় অধীনে এনে শ্রেণিসংগ্রামও উঠে যায় উচ্চতর একটা স্তরে।

স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্রের সাধারণ বুলি আসলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা একটা বোধের অন্ধ পুনরাবৃত্তির সমতুল্য। এই সব সাধারণ বুলির সাহায্যে প্রলেতারিয় একনায়কত্বের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সম্পাদন করতে যাওয়ার অর্থ সম্পূর্ণত বুর্জোয়ার তাত্ত্বিক এবং নৈতিক অবস্থানে চলে আসা। প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটা দাঁড়ায় শুধু এই ঃ কোন শ্রেণির নিপীড়ন থেকে মুক্তি? কোন শ্রেণির সঙ্গে কোন শ্রেণির সাম্য? গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের জন্য সংগ্রামের বনিয়াদে?

'অ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থে এঙ্গেলস বহু আগেই বলে গেছেন যে, শ্রেণি বিলোপের অর্থে সাম্য না বুঝলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা হওয়ায় সাম্যের বোধটা পরিণত হয় মন গড়া ধারণায়। সাম্যের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বোধের পার্থক্যের এই প্রাথমিক সত্যটা ক্রমাগত ভুলে যাওয়া হচ্ছে। আর এ সত্য যদি না ভোলা হয়, তা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণি বিলোপের দিকেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করছে এবং তা সুসম্পন্ন করতে প্রলেতারিয়েতকে রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রভাব বিস্তার ও চাপের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

(অসমাপ্ত প্রবন্ধ। ৩০ অক্টোবর, ১৯১৯-এ লিখিত। সংগৃহীত রচনাবলি, ৫ম রুশ সংস্করণ, ৩৯ খণ্ড।)

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
বাম ঐক্য প্রসঙ্গে
প্রভাস ঘোষ
মূল্য ঃ ৬ টাকা

মাশুল কমানোর দাবিতে অ্যাবেকা সভাপতির ওয়াক আউট

১৯ নভেম্বর বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইন অমান্য

৫ নভেম্বর বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিসে উপদেষ্টা কমিটির মিটিং-এ অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে এক লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু কমিটি সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় প্রতিবাদে তিনি ওয়াক আউট করেন।

কী বলা হয়েছিল সেই প্রস্তাবে? বলা হয়েছে ' এ কথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মাশুল ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। এই মাশুল পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বহন করতে অপারগ। অস্বাভাবিক এই মাশুল বৃদ্ধির জন্য এ রাজ্যের কৃষি, বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে এই সভা অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলছে।

এই সভা এ কথাও মনে করে যে, এম ভি সি এ রেগুলেশনকে হাতিয়ার করে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি বারবার তাদের ইচ্ছানুযায়ী মাশুল বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এই এম ভি সি এ রেগুলেশন বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বিরোধী। ফলে এই সভা অবিলম্বে এম ভি সি এ রেগুলেশন প্রত্যাহারের সুপারিশ করছে।

এই সভা এ কথাও মনে করে যে, দিল্লির মতো পশ্চিমবঙ্গের সি ই এস সি সহ সকল বিদ্যুৎ কোম্পানির অ্যাকাউন্টস তদন্ত করলে দুর্নীতি ধরা পড়বে। ফলে এই সভা সেই তদন্ত করার জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অনুরোধ করছে।

এই সভা জানতে পেরেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি প্রতি ইউনিটে ২৩৭ পয়সা মাশুল বৃদ্ধির জন্য দিল্লিতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেছে। এর ফলে বণ্টন কোম্পানির ১ কোটিরও বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহকের মাশুল বিপুলভাবে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে প্রায় ৯ টাকা ইউনিট হবে। অ্যাডভাইসরি কমিটি এ সি ডি সি এল-কে অবিলম্বে এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে এ সি ডি সি এল-কে বিরত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করছে।'

এই প্রস্তাব পেশ করে অ্যাবেকার সভাপতি বলেন, এক ঘন্টার মধ্যে এই প্রস্তাব পাশ না হলে তিনি প্রতিবাদে মিটিং থেকে ওয়াক আউট করবেন। প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি ওয়াক আউট করেন। পরে ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা হলে, এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি, বিগত ও বর্তমান সরকার এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মিলে এক জনবিরোধী চক্র গড়ে তুলেছে। তার ফলেই ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি ও দুর্নীতি চলছে। তাই কমিশন ও সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি সর্বস্তরের জনসাধারণকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী বলেন, অবিলম্বে ৫০ শতাংশ মাশুল কমানো, এম ভি সি এ বাতিল এবং সি ই এস সি সহ সকল বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টস তদন্তের দাবিতে ১৯ নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় আইন অমান্য আন্দোলন হবে। এতেও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিলে রাজ্য ব্যাপী আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আসামের কাছাড় জেলা ছাত্র সম্মেলন

এ আই ডি এস ও-র চতুর্থ কাছাড় জেলা ছাত্র সম্মেলন ১০ -১১ অক্টোবর শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়। পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, শিলচর মেডিকেল কলেজে নিউরোলজি ও নেফ্রোলজি বিভাগ চালু সহ দশ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অধিবেশনের পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে। প্রকাশ্য অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) দলের জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামদেও কুর্মি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র আসাম রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড জিতেন্দ্র চালিহা এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব। ১১ অক্টোবর প্রতিনিধি সম্মেলনে কমরেড স্বাগতা ভট্টাচার্যকে সভাপতি, কমরেডস গৌরীশ দেব ও প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে সহ সভাপতি, গৌরচন্দ্র দাসকে সম্পাদক এবং পল্লব ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে মোট ১৪ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি এবং ৩২ সদস্যের জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কলকাতায় দেখা করল ডি এস ও প্রতিনিধি দল

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করা এবং নন-নেট গবেষকদের ফেলোশিপ চালু রাখার দাবিতে ৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল এআইডিএসও। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে একটি আলোচনা উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। মন্ত্রী স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করলে ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান শুরু করে। অবশেষে তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করতে বাধ্য হন। তিনি আগামী শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করার নিশ্চয়তা দেন। তিনি আরও বলেন নন-নেট গবেষকদের ফেলোশিপ আগের মতোই চালু রাখা হবে। ইতিপূর্বে আওতার বাইরে থাকা স্টেট ইউনিভার্সিটিকেও এই ফেলোশিপের আওতাভুক্ত করার দাবিও মেনে নেন তিনি।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় এ দিন এক বিবৃতিতে বলেন, এই জয় সঠিক নেতৃত্বে ও সঠিক রাস্তায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও জনগণকে যুক্ত করে যে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র আন্দোলন চলছে তারই জয়। তিনি বলেন, সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।

বলরামপুরে বিডিও দফতর অভিযান

পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লক এলাকার সমস্ত হাসপাতালগুলির সার্বিক উন্নয়ন, ধাত্রী-মায়েদের ট্রেনিং দিয়ে নিয়মিত কাজ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশ-ফেল চালু সহ জনগণের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানে ২৯ অক্টোবর বিডিও দফতরে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখান। বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়

জনগণকে লুঠের নতুন রাস্তা নিল কেন্দ্রীয় সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বিহারে বিধানসভা ভোট মিটতে না মিটতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপর আক্রমণের ঢল নামিয়ে এনেছে। এর মধ্যে আছে 'স্বচ্ছ ভারত সেস' বসিয়ে পরিষেবা কর ১৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪.৫ শতাংশ করা। রেলের টিকিট বাতিলের চার্জ দ্বিগুণ হচ্ছে শুধু তাই নয়, ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার চার ঘন্টা আগে টিকিট বাতিল না করলে টাকা ফেরত বন্ধ হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত একটি বিশেষ আয়ের উপরের পরিবারগুলির জন্য রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি বন্ধ করে দেবে।

দারিদ্র, বেকারি এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির গুরুভারে পিষ্ট জনসাধারণের ঘাড়ে নতুন করে বিপুল আর্থিক বোঝা চাপানোর দ্বারা বিজেপি সরকার তার জনবিরোধী ও পুঁজিপতি তোষণকারী চরিত্রকেই আবারও নগ্ন করল। সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় যে, আপাদমস্তক অস্বচ্ছ এবং অপরিচ্ছন্ন একটি সরকার দেশকে জঞ্জালমুক্ত করার কথা বলছে, যা মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ারই কৌশল। বিজেপি জনগণকে সস্তার দূষণমুক্ত জ্বালানি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, বেশ কিছুদিন ধরে ভর্তুকি ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচার চালিয়ে জমি তৈরি করে এখন সরাসরি আঘাত হানল। বিহারে বিধানসভা ভোটে যাতে মানুষের ক্ষোভের কোনও প্রতিফলন না ঘটে, সেজন্য নির্বাচনপর্ব শেষ হওয়ার পরেই এই ঘোষণা করা হল।

জনগণকে প্রতারিত করে লুণ্ঠনের এই নীতিকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। জনসাধারণের কাছে আবেদন, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী গণআন্দোলনে সামিল হোন। এ সত্যও বোঝা দরকার যে, সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনই যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান জনবিরোধী ভূমিকাকে প্রতিরোধ করতে পারে।

মার্কিন ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের চরিত্র একই রকম

আমেরিকার প্রথম সারির শিল্পপতিদের সাথে ভারতের প্রথম সারির শিল্পপতিদের একটা সাদৃশ্য সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সকলেই জানেন, ভারতের শিল্পপতিরা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চালাচ্ছে। অর্থনীতির পণ্ডিতরা মনে করেন কালো টাকার রমরমা মূল্যবৃদ্ধি এবং রাজকোষ ঘাটতির একটি অন্যতম কারণ। ফলে পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কুফল অর্থনীতিতে এবং সমাজজীবনে অনেক গভীর। আমেরিকার পুঁজিপতিদের সাথে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সাদৃশ্যের অন্যতম জায়গা এই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া।

আমেরিকার পুঁজিপতিরা কত ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে?সেখানকার একটি সংস্থার সার্ভে রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ইকনমিক টাইমস (৭.১০.২০১৫) লিখেছে, আমেরিকার বৃহত্তম ৫০০ শিল্প সংস্থা ৬২০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৬২০০ কোটি ডলার ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে। এক ডলার ৬০ টাকা ধরলে, ফাঁকি দেওয়া ট্যাক্সের পরিমাণ হল ৩ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা। এইসব কোম্পানির মধ্যে রয়েছে অ্যাপল, জেনারেল ইলেকট্রিকের মতো নামজাদারাও।

কীভাবে এই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়েছে? ভারতীয় পুঁজিপতিরা মরিশাসের মতো দেশে (যেখানে কর দিতে হয় না), টাকা জমা রেখে যেভাবে সরকারকে ফাঁকি দেয়, আমেরিকার পুঁজিপতিরাও তেমনি ফাঁকি দেয় বারমুডা, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি 'ট্যাক্স হেভেন' দেশকে। ব্যবসায় এটাই পুঁজির ধর্ম। সব দেশের পুঁজিপতিরাই সর্বোচ্চ মুনাফা করতে শোষণ-লুণ্ঠন-কর ফাঁকি সহ যাবতীয় সব পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকে। এদের চরিত্র এমনই লুঠেরা।

এদের ছলাকলার অন্ত নেই। দেশের যে টাকা তারা বিদেশে পাঠাচ্ছে, যা অবৈধ এবং কালো টাকা বলে কুখ্যাত, সেই টাকাই বিদেশ ঘুরে 'ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট' বা এফ ডি আই হিসাবে আবার দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এভাবে পুঁজিপতিরা কালো টাকাকে শুধু সাদা করছে তাই নয়, একই সঙ্গে বিনিয়োগকালে আদায় করে নিচ্ছে স্পেশাল ইকনমিক জোনে বরাদ্দ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা। লক্ষ করার বিষয়, এই পুঁজি (এফ ডি আই) ধরে আনতে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীরা বিদেশে যাচ্ছেন এবং লাল কার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা অসহিষ্ণুতার পরিবেশের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা বিজ্ঞানচর্চার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা গভীর উদ্বেগে লক্ষ করছি ভারতে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিকে ক্রমশ ধ্বংস করা হচ্ছে। এই অসহিষ্ণুতা এবং কোনও রকম যুক্তির তোয়াক্কা না করার পরিবেশের হাত ধরেই দাদরিতে মহম্মদ আখলাককে পিটিয়ে হত্যা থেকে এম এম কালবার্গি, নরেন্দ্র দাভোলকর ও গোবিন্দ পানসারের হত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারল। এঁরা সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে কুসংস্কার ও যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। কালবার্গি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং দ্বাদশ শতকের বচন সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ। যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াকু সমাজ সংস্কারক বাসব-এর সংগ্রামকে ভিত্তি করে। একইভাবে, দাভোলকর এবং পানসারে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ভারতের সংবিধানের ৫১এ(এইচ) ধারায় বলা হয়েছে, জনগণের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হল সমাজে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলা, মানবিকতা ও অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করে সমাজসংস্কারে সাহায্য করা। দুর্ভাগ্যবশত, এর ঠিক বিপরীত কাজ করছেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিরা।

লেখকরা প্রতিবাদের একটা পথ দেখিয়েছেন। আমরা বিজ্ঞানীরা এখন তাঁদের সাথে গলা মিলিয়ে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ভারতের জনগণ যুক্তি, বিজ্ঞান ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সহজে মেনে নেবে না। মানুষ কী পরবে, কী খাবে, কী চিন্তা করবে ও কাকে ভালোবাসবে এসবের উপর খবরদারি করার ধ্বংসাত্মক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা মানছি না। আমরা ভারতের সমস্ত অংশের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার উপর যে আক্রমণ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

আল্লাদি সীতারাম, অশোক সেন, অশোক জৈন, এ গোপালকৃষ্ণান, ডি বালাসুব্রামানিয়ান, মাদাবুসি রঘুনাথন, পি এম ভার্গব, পি বলরাম, সত্যজিত মেয়র, স্পেন্তা ওয়াডিয়া, এ পি বালাচন্দ্রন, বিদিতা বৈদ্য, বিনিতা বল, বিশাল বাসান, বিবেক বোরকর সহ আরও ৯০ বিজ্ঞানী দ্বারা স্বাক্ষরিত।

ওড়িশায় বিশাল কৃষক বিক্ষোভ

ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যা রোধ, খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, জমি অধিগ্রহণ বিল বাতিল প্রভৃতি দাবিতে এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে এক বিশাল মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সচিবালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড উদ্ধব জেনা, সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস, সহ সভাপতি কমরেড সদাশিব দাস এবং অনগুল, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝরের জেলা সম্পাদকগণ। ওড়িশার রাজস্বমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

গোসাবায় কলেজের দাবিতে ছাত্র কনভেনশন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবার ছোটমোল্যাখালিতে কলেজ নির্মাণের দাবিতে ১২ অক্টোবর মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এক কনভেনশনের ডাক দেয়। নদীবহুল এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বহু দূরের কলেজে পড়তে যেতে হয়। কনভেনশনে দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও বহু শিক্ষক-অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য কনভেনশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমির আলি মোল্যাকে সম্পাদক ও মজিদ খানকে সভাপতি নির্বাচিত করে ২৪ জনের ছাত্র কমিটি ও একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনের বক্তব্য রাখেন শ্রাবণী ভূঁইয়া, খুকুমণি সরদার, আমির আলি মোল্যা, আজাহার গাজি, মজিদ খান, শিবনাথ দলুই, বিশ্বনাথ সেন, দীনবন্ধু মণ্ডল, হরিপদ মণ্ডল প্রমুখ।

কলকাতায় পরিচারিকাদের বিক্ষোভ সমাবেশ

'ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খাটি। কিন্তু কোনও মর্যাদা পাই না। পুজো-পার্বণে বাবুরা ছুটি পান, আমাদের ছুটি নেই। অসুখে পড়ে একদিন কামাই হয়ে গেলে নিস্তার নেই। কেন, আমরা কি মানুষ নই!' বলছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতিমা কোলে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্ধ্যা সরদার, হুগলির পূজা প্রামাণিক রা। বলতে বলতে কান্নায় চোখ ভিজে যাচ্ছিল। গলা ধরে আসছিল। দেখে মঞ্চে উঠে এলেন আর একজন। সুদূর দার্জিলিং জেলা থেকে আসা রূপা। অপটু অনভ্যস্ত ভঙ্গি, কিন্তু দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ। বললেন, 'চোখের জল, দুর্বলতা আর নয়। অনেক দিন অপমানিত হয়েছি, লাঞ্ছনা সয়েছি। তখন একা ছিলাম। এখন এত বড় সংগঠন আমাদের। একজনের দুর্দশায় সকলে মিলে এগিয়ে যাব। লড়াই করব, দেখব দাবি আদায় হয় কি না'।

এঁরা সবাই পরিচারিকা, খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়া, সবচেয়ে নির্যাতিত, শোষিত। ৪ নভেম্বর 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি'র ডাকে রাজ্যের ১৯টি জেলা থেকে এসে সমবেত হয়েছিলেন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের বিক্ষোভ সমাবেশে। শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরি সরকারিভাবে ঘোষণা, সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মতো তাঁদেরও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা সহ ১২ দফা দাবিতে শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন তাঁরা। এই দাবিতে সংগৃহীত হাজার হাজার পরিচারিকার স্বাক্ষর নিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পালের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল এ দিন শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পরিচারিকারা যাতে নির্মাণকর্মীদের জন্য বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তত পান, তা তিনি দেখবেন। বিক্ষোভ সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী লিলি পাল ক্ষোভের সাথে জানান, ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮ অনুসারে কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে পরিচারিকাদের সাপ্তাহিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কাজের ভিত্তিতে বেতন, ন্যূনতম মজুরি কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে আজও তা হয়নি। অতীত এবং বর্তমানের কোনও সরকারই তা কার্যকর করেনি। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য, জয়শ্রী চক্রবর্তী, অপর্ণা গুহ, পুষ্প পাল, প্রভাতী গোস্বামী, লক্ষ্মী সরকার, অসীমা পাহাড়ী, রাধা মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org